অক্রূর সংবাদ

বাণী বসু

রণিতা আর সৃঞ্জয় দুজনেই ভেবেছিল। অনেক, অনেক। সৃঞ্জয়ের বাবা-মা নেই। কিন্তু রণিতার বাবা মা আছেন। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে বড়ই স্নেহে জড়ানো। বিশেষট নিজের বাবা-মা নেই বলে সৃঞ্জয় রণিতার বাবা-মাকে খুবই ভালবাসে। যদিও ভালবাসা শব্দটার অর্থ নেহাতই আপেক্ষিক। রণিতা বাবা-মার দেখাশোনা করবে -- এটার তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। এই পর্যন্ত। প্রয়োজন পড়লে সেও আছে। নির্মাল্যবাবু অর্থাৎ রণিতার বাবার যখন বাইপাস সার্জারি হল, তখন তার চাকরির কড়া শর্তগুলো মেনেও সে যথাসাধ্য দৌড়াদৌড়ি করেছে। তা ছাড়া ওঁদের সঙ্গ সে খুবই পছন্দ করে। নির্মাল্যবাবু অধ্যাপক ছিলের সাহিত্যের। সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সৃঞ্জয় সাহিত্যজগতের অনেক খবর জেনে যায়। নির্মাল্যবাবুর স্ত্রী সুমিতাও সাহিত্যেরই ছাত্রী ছিলেন, গান জানেন ভাল। এখন গলাটা নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু শোনেন প্রচুর। শ্বশুর, শাশুড়ি, মেয়ে-জামাই, আমজাদ আলি, কি উলহাস

কলসকর, অজয় চক্রবর্তী কি রশিদ খান বাদ দিতেন না। ইদানীং অবশ্য একটু অসুবিধা হচ্ছিল -- কারণ টেডি। টেডি রণিতাদের একমাত্র ছেলে। এই বছর ছয়েক বয়স হল। সে হয়ে অবধি আর চারজনে মিলে গান শুনতে কি নাটক দেখতে যাওয়া হয় না। মা-বাবা যায়। টেডি থাকে দাদু-দিদার কাছে। খুব ছোট্ট থেকে এইভাবেই বড় হয়েছে সে। একেবারে দাদু-দিআর কোলে কোলে। খাইয়ে দেবে কে ? দিদা। ঘুম পাড়াবে কে ? দিদা। গল্প বলবে কে ? দিদা। বাবা-মা গান-টান শুনতে গেলে তো টেডির পোয়া বারো। মা বইখাতা দিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু সে সবে সে হাত ছোঁয়ালে তো। তার দস্যিপনা থামাতে দিদা গল্প বলতে শুরু করেন -- এক দেশে এক রাক্ষস ছিল। কী রে রাক্ষস-টাক্ষস বললে আবার ভয় পাবি না তো ?

টেডি বলে, উঃ দিদা, আমি জানি রাক্ষস মিছিমিছি। বলতে বলতে সে অবশ্য দিদার কোলে ঘেঁষটে আসে।

টেডির নামের একটা ইতিহাস আছে। আরও অনেক বাচ্ছার মতোই টেডিরও একাধিক টেডি বেয়ার আছে। তার মধ্যে ছাই ছাই রঙের পুঁতি-চোখো, গুটলি-নাইকুন্ডুলি, সুতো বাঁধা ভোঁতা মুখোটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে যায় আট-ন'মাস বয়স থেকে। সেই টেডির সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্যতার কারণেই টেডি নামটি প্রাপ্ত হয়েছে সে। টেডি কোলে করে খাবে, টেডিকে নিয়ে ঘুমোবে, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছে, কাঁখে টেডি। সে সময়ে টেডি তো তার সমান সমানই ছিল। টেডি আঁকড়ে যখন সে ঘরবার করত সবাই বলত -- ওই যে, ডাবল টেডি যাচ্ছে। টেডি স্কোয়ার। ফলে একমাত্র তার বাবা-মা ছাড়া কেউই তাকে 'টুটু' বলে না। মাঝে মাঝে তারাও ভুল করে 'টেডি'ই বলে ফেলে।

এইসব কারণেই রণিতা আর সৃঞ্জয় অনেক ভেবেছিল। কলকাতার টান তাদের কারও কম না। এখানকার সাংস্কৃতিক পরিবেশেই তারা মানুষ হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় কাজের কোনও আবহাওয়াই নেই। অনেক চেষ্টা করেও সৃঞ্জয় মানাতে পারছিল না। মানতে পারছিল না। তাই পুনা। বিলেত নয়, আমেরিকা নয়, মধ্যপ্রাচ্য নয়, মাত্রই পুনা। বাইরের সব অফার সৃঞ্জয় ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু এবার অন্তত পুনায় না গেলে, তার জব-স্যাটিসফ্যাকশন তো দূরের কথা, উন্নতিরও কোনও সম্ভাবনা নেই। টেডিকে পুনার ভাল স্কুলে পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে ভর্তি করানো হল। ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর মা-বাবার কাছে কথাটা ভাঙল রণিতা।

শুনে দুজনেই যেন কেমন থম মেরে গেলেন। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। অনেকক্ষণ পরে নির্মাল্যবাবু ছোট্ট গলায় বললেন -- যাহ !

সুনিতা উঠে গেলেন। -- মা, ওমা, কোথায় যাচ্ছ ? রণিতা পেছন পেছন দৌড়য়। সেও বড় মাতৃভক্ত। কাছাকাছি থাকতো। মায়েদের অসুবিধেতে তারা, তাদের অসুবিধে তো মায়েরা, এমনই চলে এসেছে।

সুনিতা বাথরুমে ঢুকেছেন। রণিতা বাইরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতরে প্লাস্টিকের বালতিতে তুমুল জল পড়ার শব্দ। অনেকক্ষণ পরে সুমিতা বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুখ-চোখ ফুলে গেছে। লাল।

রুক্ষ গলায় বললেন -- তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছিস। তোদের জন্যে কি একটু নিশ্চিন্তে বাথরুম যেতেও পারব না ?

-- মা প্লিজ, তোমাদের ছেড়ে যেতে কি আমারই ভাল লাগছে। কী করব। ও তো কিছুতেই এখানে থাকতে চাইছে না। ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড। বলছে তাহলে টুটুকে নিয়ে তুমি এখানে থাকো। আমি চলে যাই ... বলতে বলতে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল রণিতা -- কোথায় তুমি আমায় সাহস দেবে ! তোমাদের ছাড়া আমি কী করে থাকব, বলো তো ? ও মা-আ-আ ... সুমিতা বাচ্চা মেয়ের মতো মায়ের বুকে মুখ গুঁজল।

সৃঞ্জয় এসে গেছে। এমন দৃশ্যে সে একটু অপ্রতিভ। তবু বলল -- আচ্ছা মা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া মানেই পর হয়ে গেল এমন একটা কথা আছে না ?

নির্মাল্যবাবু বললেন, না সৃঞ্জয়, ছেলের বিয়ে দিলে যেমন সে পর হয়ে যায় না। মেয়ের বিয়ে দিলেও সে পর হয়ে যায় না। পর যদি হতে চায়, মেয়েও হয়, ছেলেও হয়। তিনি হাসিমুখেই বলছিলেন কথাগুলো, কিন্তু তাঁর হতাশা গোপন থাকেনি।

সুমিতা বললেন, তোমার মনে থেকে থাকবে সৃঞ্জয়, রাণুর বিয়ের সময় আমরা কন্যাদানের অনুষ্ঠানই করিনি। কন্যা তো জিনিস নয়, যে তাকে দান করব। আর ঠিক সেইভাবেই আমরা নিখিলদার কাজে বলেছিলাম, এখন থেকে মেয়ে আর ছেলে দুজনে আমাদের উভয় পক্ষের। আমি তোমাকে আমার ছেলের মতোই দেখি। কী ? দেখি না।

-- আহা - সৃঞ্জয় অপ্রতিভ তো বোধ করছিলই, সেই সঙ্গে তার রাগও হচ্ছিল বিলক্ষণ। বিলেত না, আমেরিকা না -- হাতের কাছে পুনে ... তাতেই এই।

-- তা কেন ? এই তো হাতের কাছেই ... সে তো তো করে সেটাই বলে।

-- না, তুমি পর হয়ে যাওয়ার আদ্যিকালের ধারণাটার কথা বললে কিনা, তা ...

টুটু বা টেডি এতক্ষণ অন্য ঘরে টিভিতে কার্টুন দেখছিল। এখন বেরিয়ে এসে দিদার আঁচল ধরে ঝুলে পড়ল -- ও দিদা, তুমিও চলো না পুনা। ও দাদু, দিদাকে বলো না।

-- বারে ! তাহলে আমার কাছে কে থাকবে রে !

-- তুমিও যাবে ! আবদেরে গলায় টুটু বলল -- আমরা সবাই যাব। জয়েন্ট ফ্যামিলি বেশ !

তার কথা শুনে চারজনের মুখেই হাসি। যেখান থেকে যা শুনছে লাগসই হলেই রপ্ত করে ফেলছে সে। সৃঞ্জয় বলল, ও তো ঠিকই বলেছে বাবা, আপনারা মাস তিন চার করে পুনেতে থাকবেন। আমাকে তো কলকাতার অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হবে। আসবও। আর টুটুর ছুটি পড়লে ...

-- আমার ছাত্রগুলো কে পড়াবে রে ? দাদু ? নির্মাল্য হেসে টেডিকে জিজ্ঞেস করেন।

ছাত্রদের জন্য অন্য সার ঠিক করে দাও। টেডির কাছে সব সমস্যার সমাধান আছে।

কিন্তু যাবার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল টেডি কেমন গোমড়া হয়ে যেতে লাগল। বেঁকে বসছে। দিদুরা না গেলে আমি যাব না।

-- বেশ যাসনি। তাহলে দিদুর কাছে থাক। আমরা চলে যাই।

টেডি ভ্যাঁ। মা-বাবাকে ছেড়েও সে থাকতে চায় না। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সে তো হাতি ঘোড়া কিছুই চায়নি। কোনও দামি খেলনা না, খাবার না, শুধুমাত্র চারজনের সঙ্গে থাকতে চেয়েছে। মা, বাবা, দাদু, দিদা আর সে। এইটুকু দিতে

বড়দের অত আপত্তি কেন ? টেডিকে কাঁখে নিয়ে সে কাঁদো কাঁদো মুখে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

মহা মুশকিল হল। সৃঞ্জয় বলল, আরও ছেলের সামনে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদো। একটু যদি ম্যাচুওরিটি থাকে।

-- আমি কী করব। মায়ের যা কষ্ট। চোখে জল এসে যায় রণিতার।

-- আশ্চর্য ! মা একজন বুদ্ধিমতী যুক্তিবাগী মহিলা। যিনি কিন্ডার গার্ডেন পড়ান। একটুও হিউম্যান সাইকোলজি ... একটুও ...

রণিতা বলল, যদি ম্যাচুওরিটি থাকে। না ?

ব্যাস। দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল।

এমন সময়ে সুমিতা ঘরে ধুকলেন। আকাশি নীল শাড়ি, হাত খোঁপা, হালকা লিপস্টিক, ব্রাউন ব্যাগ। বললেন -- কী হচ্ছে ? ও ঘরে টেডি, এখানে তোমরা ... গলা নিচু করো ... গলা নিচু করো ...

-- তোমাকে দরজা খুলে দিল কে ? বেল শুনিনি তো ?

-- খুকু খুলে দিয়েছে। বেল বাজার আগেই। কোথায় যাচ্ছিল। কেন তোমাদের অসুবিধা হল ?

সৃঞ্জয় মৃদু গলায় বলল -- কী যে বলো।

-- সমস্যাটা বল ? সুমিতা বললেন।

-- টুটু বড় গোলমাল করছে। বলছে যাব না।

-- জামাকাপড় প্যাক করে, সুটকেস-টেস নিয়ে যাওয়ার জন্যে তোমরা বেরিয়ে পড়লে ঠিকই যাবে !

-- দু-দুবার সব প্যাকিং হাঁটকে পাঁটকে দিয়েছে -- রণিতা জানায়।

হঠাৎ সুমিতার গলায় একটা হইচইয়ে খুশির সুর। আদর-গলা স্নেহের সুর উঠে আসে।

-- টেডি ? টেডি কোথায় রে ? ও মা। টেডি বুঝি লুকিয়েছে ? যাহ, তাহলে তো আমাকে চলে যেতে হয়, টেডিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

তখন টেডি, তার টেডি কোলে গুটিগুটি এসে ঘরের দরজার মুখে দাঁড়ায়। তার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি।

সুমিতা সঙ্গে সঙ্গে তাকে হুশ করে কোলে তুলে নেন, এক যে ছিল ছেলে বুঝলি টেডি। ছেলেটা যেমনি বোকা তেমনি চালাক।

টেডি হেসে ফেলে -- বোকাও আবার চালাকও। ধ্যাৎ।

সুমিতা তাকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন -- অঙ্ক পারে ভাল, টকাটক কষে দেয় সব, বাংলা-ইংরেজি 'বানান' সব পটাপট ঠিক। ছবি আঁকে কী সুন্দর। ফিরিওলা, সার্কাসের ক্লাউন, পুকুর ধারে নারকোল গাছ ... পাহাড় ... সূর্যিমামা ... তা সে চালাক নয় তো কী।

টেডি হি হি করে হেসে বলে, সুযযি মামা, সুযযি মামা, দিদু তুমি সুযযি মামা বলো কেন ?

দিদু তার গালে চুমি দিয়ে বললেন, আমাদের ছোটবেলায় সূর্য, চাঁদ সব আমাদের মামা ছিলেন সে ভাই। সুযযি মামা, চাঁদমামা। আমার মা বলতেন, থাকুমা বলতেন।

একটু ভাবিত হয়ে পড়ে টেডি। এটা কী রকম ব্যাপার ? এক সময়ে চাঁদ-সূর্য মামা ছিলেন, এখন আর নেই। নেইই তো। তাদের বইয়ে ছবি দেওয়া আছে সূর্য একটা তারা, তার চারপাশে পৃথিবী ঘুরছে, পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে চাঁদ।

দিদু তখন বলতে শুরু করেছেন -- সুযযি টুযযি ছাড়ো। ছেলেটা এত চালাক অথচ বোকা কেন জিজ্ঞেস করলে না তো !

-- কেন ? সরতে সরতে দুজনে তখন ঘরের মধ্যে ডিভানে।

-- আরে ! ছেলেটা বেড়াতে ভালবাসে না। তুই ভালবাসিস তো !

-- হ্যাঁ-অ্যাঁ। পুরী গেছি। কী সুন্দর সমুদ্র। চান করেছি দিদু। নুলিয়াদাদাকে ধরে, মাটা কী ভিতু, কিছুতেই চান করেনি।

-- তাই বুঝি ! আর পাহাড় ? পাহাড়ে গেছিস ?

-- ওরে বাবা, পাহাড়ে আগুন থাকে।

-- পাহাড়ে আগুন ? দিদু অবাক।

-- ভেতর থেকে আগুন বেরোয় না ?

-- ওহ হো তুই ভলক্যানোর কথা বলছিস ? সে তো আলাদা রকম পাহাড়। আমাদের হিমালয়ের মতো চমৎকার তুষারকিরীট পাহাড় নাকি ?

-- তুষারকিরীট কী দিদু ?

-- ওই যে মাথায় বরফ জমে, তাকে বলে তুষার। ঠিক মুকুটের মতো দেখায় মুকুট হল কিরীট। তুই খুব ছোট্টবেলায় গেছিস, দার্জিলিঙে, ভুলে গেছিস।

-- দিদু আমি তো হংকংও গেছি, আর দিল্লি-আগরা ... তাজমহল ...

-- মনে আছে ? ভাল লেগেছিল ?

-- হুঁ-উ-উ

তখন দিদু বলতে থাকেন -- সে এক চমৎকার জায়গা -- পশ্চিমঘাট পাহাড়ের উপর। না ঠান্ডা, না গরম। তুষার পড়ে না বটে। কিন্তু চমৎকার সব গাছের সবুজ কিরীট পরে থাকে ওরা। প্রশ্বাস নিলে একেবারে পরিষ্কার হাওয়া ফুসফুসের মধ্যে ঢুকে যায়। স্বাস্থ্য ভাল করে যে কোনও বাচ্চাকে শচীন তেন্ডুলকরের মতো ফিট করে দেয়। চমৎকার খেলার জায়গা সেখানকার স্কুলে। বিরাট। সেখানে ক্রিকেট ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, সবরকম খেলে বাচ্চারা। নীল টলটল করছে সুইমিং পুল। সেখানে সাঁতার কাটে। আর টিচাররা কী ভাল ! কী ভাল ! ভীষণ ভালবাসেন বাচ্চাদের।

-- আমাদের ‘অক্‌সরে’র মতো ?

-- আরও বেশি। সেখানে আশেপাশে চমৎকার সব পাহাড়ি জায়গা আছে। ঝরনা ঝরছে বারবার করে। দুধের মতো তার ধবধবে রঙ। টিলা টিলা পাহাড় আছে শহরের মধ্যে। তার উপর মন্দির। বাচ্চারা ছুটতে ছুটতে তার উপর উঠে যায়। আবার ছুটতে ছুটতে নেমে আসে। সে এক মজা। এই সুন্দর জায়গাটে ওই ছেলেটা যদি না যেতে চায় তাকে তো বোকা বলবে ? কি বলবে না ?

টেডি সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। তার খটকা লেগেছে। তাকে কি কোনও ফাঁদে ফেলা হচ্ছে ?

-- ওই জায়গাটা কি পুনা ? সে ভেবেচিন্তে বলে।

হেসে ওঠেন দিদু -- ঠিক বলেছিস। একদম ঠিক। কী করে বললি ?

হাততালি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে টেডি। বলতে পেরে-ছি, পেরে-ছি।

-- আমি জনতুম তুইই পারবিই। কেন না তুই তো বোকা-চালাক ছেলে নোস, তুই হলি চালাক-চালাক ছেলে।

-- তাপ্‌পর ? খুশি খুশি মুখে টেডি বলে।

-- তারপর ? সেখানে শীতে অনে-ক দিন ছুটি দেয়, তখন দাদু-দিদারা হুশ করে চলে যান। অর তারপরে ? বেড়ানো, খালি বেড়ানো, আর খেলা। লুডো, দাবা, স্ক্র্যাবলস জিগস পাজল।

-- আর ক্রিকেট ?

-- ক্রিকেটটা আর আমাকে খেলতে বলিসনি টেডি।

-- কেন ? তোমাকে ছুটে রান করতে হবে না। দেয়ালে লাগলে এক। ঘরের বাইরে গেলে চার আর রান্নাঘরে ধুকে গেলে-এ ওভারবাউন্ডারি।

ঠিক আছে, এতটা যখন ছাড় দিচ্ছিস, তখন ভেবে দেখতে পারি। তবে সমস্যাটা হল -- তোর মা কি দেয়ালে লাগা-টাগাগুলো পছন্দ করবে ?

পরদিন ভোর ছটার ফ্লাইটে চলে যাবে রণিতারা। আগের দিন সন্ধেয় নির্মাল্য অর সুমিতা দেখা করতে গেলেন। চারখানা পেল্লাই পেল্লাই সুটকেস। আরও যাবে। প্যাকার্স অ্যান্ড মুভার্সরা সব জিনিসপত্র প্যাক করে নিয়ে গেছে।

-- তোর সাইকেলটা গেছে তো ? নির্মাল্য জিজ্ঞেস করলেন।

-- হ্যাঁ-অ্যা বলতে বলতে টেডি দিদুর কোলে এসে গুছিয়ে বসল। তার কোলে তার টেডি।

-- আর মোটরকারটা ?

-- হ্যাঁ-অ্যা, আর ব্যাট-বল, চেস-বোর্ড, দম দেওয়া গাড়ি, স্ক্র্যাবলস, চাইনিজ চেকার ... সব।

-- তোর হলুদ গেঞ্জিটা নিয়েছিস তো ?

-- কোনটা ? যেটাতে মারাদোনা লেখা ?

-- হ্যাঁ হ্যাঁ।

-- ওটা নিয়েছি আর পিংকটা। সবুজটা। খালি বেগুনি আর ব্রাউন আরও সব খুকুদিদির ভাইয়াকে দিয়ে দিয়েছি। জিপ গাড়িটা মুনিয়াকে, ঝাঁঝরি বাজানো পুতুলটা কুটুকে ...

দিদু হেসে বললেন, আর আমাকে ? আমাকে বুঝি কিছু দিবি না ?

রাত দশটা। নির্মাল্য আর সুমিতা উঠে পড়েন। দরজার কাছ অবধি এসেছে টেডি হঠাৎ তার কোল থেকে টেডিকে দিদুর দিকে বাড়িয়ে দেয়। টেডিকে তুমি রেখে দাও।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন দিদু। সে যদি মত বদলায়। টেডি ছাড়া তো তার এক মুহূর্তও চলে না কি না। কিন্তু না, টেডিকে নিঃস্বত্ব হয়ে দিদুকে দান করে দিয়েছে সে।

সকাল সতটায় বেরোনো, দুপুর দুটোয় ফেরা। সারাক্ষণ বাচ্চাদের হই-চই দাপাদাপি। তাদের কিউ করে দাঁড় করিয়ে গার্জেনের হাতে তুলে দেওয়া -- তারপর প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গিয়ে দিনের রিপোর্ট পেশ, সই সাবুদ। তারপর বড় রাস্তা অবধি হেঁটে যাওয়া। অটোর ঝাঁকুনি খেতে খেতে খেতে বাড়ি আসতে ঠিক দুটো বাজে। অবসন্নভাবে হাতের ব্যাগটা সোফার উপর রেখে চোখ বুলিয়ে হেলান দ্যান সুমিতা।

-- চাকরিটা তো ছেড়ে দিলেই পারো। নির্মাল্য তাঁর কালিপড়া মুখের দিকে চেয়ে বলেন।

-- তুমি যদি বাইপাসের পরও দু-তিন ব্যাচ ছাত্র পড়াতে পারো, আমিই বা কেন ... তা ছাড়া টাকাটা তো কিছু কম নয়।

-- ও হয়ে যবে এখন।

সুমিতা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন, তারপর বলেন -- কী করব ?

ছোট্ট প্রশ্ন। কিন্তু তার উত্তর জানা নেই নির্মাল্যর। তিনি নিরুত্তরে নিজের ঘরের দিকে চলে যান। কিন্তু তার উত্তর জানা নেই নির্মাল্যর। তিনি নিরুত্তরে নিজের ঘরের দিকে চলে যান। তাঁর খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। এখন তিনি সাড়ে চারটে পর্যন্ত বিশ্রাম করবেন। তারপর একটু হাঁটতে বেরোবেন। সাড়ে ছটায় তিনটি ছাত্র আসবে। সুমিতা এখন জামাকাপড় বদলাবেন, মুখ-হাত ধোবেন। খাবেন। কোনও খাবার গরম করবেন না। কোনওমতে পেটটা ভরে গেলে থালা-বাসন সব সিঙ্কে নামিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বেন। ক্লান্ত চোখে ঘুম নামবে।

ছটা বাজে। উদ্বিগ্ন নির্মাল্য সামান্য নাড়া দেবেন সুমিতাকে -- এখনও ঘুমোচ্ছো ? শরীর-টরীর ঠিক আছে তো ?

লাল চোখ খুলবেন সুমিতা। ধড়মড় করে উঠে বসবেন, ইস ছটা ? এদিক-ওদিক তাকাবেন ঘোর চোখে। নির্মাল্য জানেন, কী খুঁজছেন তিনি।

সাড়ে-ছটা সাতটায় রুনি টেডিকে নিয়ে এসে যেত। দিদুর কাছে পড়তো টেডি। কিছুক্ষণ। তারপর খেলা খেলা খেলা। মায়ের বকুনি খেয়ে অবশেষে কার্টুন চ্যানেল খুলে বসে থাকবে। তার মা বলবে -- 'উঃ, মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলব, তারও উপায় নেই।' মা এলে এই। মায়ের ভয়ে কিছুক্ষণ পড়া। আর যেদিন টেডিকে রেখে চলে যেত রুনি। সেদিন একটু পড়া পড়া খেলার পরেই শুরু হবে টেডির গল্প শোনা। একটার পর একটা। -- উঃ আমার চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল যে।

-- আর একটা, আর মাত্র একটা দিদু।

-- ওই তোর মা এসে গেছে।

-- ঠি-ক মাকে বকাচ্ছিস ?

-- আর একটা মা ...।

নির্মাল্য অত পারতেন না। তিনি শান্ত। একটু নির্জীব ধরনের মানুষ। নিজেকে নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। সেই শান্তির জগতে টেডি দস্যুর মতো ঢুকে সব তছনছ করে দিয়ে চলে যেত। ওরে বাবারে, ভাই, আর দাপাসনি, আর নয়। অ রুনি রুনি-ই ...। টেডি যে এসেছে, তার কলকলানি যে শোনা যাচ্ছে, এই যে সে খেতে বসল। তার মা বা দিদা তাকে মাছ খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করছে -- এইই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু সুমিতার প্রাণশক্তি অফুরন্ত। সারা সকাল একগাদা বাচ্চাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে আবার সন্ধেবেলায় সে সমান উৎসাহে টেডিকে নিয়ে খেলবে, পড়াবে, গল্প বলবে। এটাই আরও আশ্চর্য লাগে নির্মাল্যর। বাচ্চার মায়া বড় মায়া। ঠিকই। কিন্তু সুমিতা তো বাচ্চাদের সঙ্গেই দিনের বেশিরভাগ সময়টা কাটাচ্ছে।

কথাটা বলেই ফেলেন তিনি। শূন্য চোখে তাকিয়ে সুমিতা বলেন -- ওই তো ! কী জানি !

ফোন করেছে রুনি -- মা, আমরা ভাল আছি। ভাবনা কোরো না। তোমরা ভাল আছো তো ?

-- হ্যাঁ, ভালই তো।

-- এত কোল্ড কেন মা ? করুণ সুরে রুনি বলে।

-- কোল্ড ? দূর। গরম হলে তোর ভাল লাগবে বুঝি ? সুমিতা শব্দ করে হাসেন।

সুমিতা একটা প্লেন মাংসের ঝোল রাঁধতেন, রেসিপিটা শুনে নেয় রুনি, তার দুটি গুজরাতি বন্ধু হয়েছে। টেডির স্কুল-বন্ধুর মা। টুটু, টুটু-উ-রুনি ডাকে।

-- হ্যালো ঃ মিষ্টি কচি গলা কেব্‌ল বেয়ে ভেসে আসে। কানের পর্দায় গভীর বিরহ আঘাত করে।

সুমিতা বলেন, তুই ভাল আছিস টেডি ? স্কুল ভাল লাগছে ?

-- হ্যাঁ, স্কুলে খুব টাস্ক দিদু ! রোজ টেস্ট। হিন্দি, লিটারেচার, ল্যাঙ্গোয়েজ জিওগ্রাফি, সায়েন্স কম্পিউটার ...

-- বলিস কী রে ! কত কী শিখে যাচ্ছিস।

-- তোমরা কবে আসবে দিদু ? তাড়াতাড়ি এসো না। এই টেলিফোনের তারটা বেয়ে চলে এসো।

আর চোখে দেখতে পান না সুমিতা, সব ঝাপসা হয়ে গেছে। গলা বোঝা।

-- দিদু-উ !

-- অনেক কষ্টে বললেন, কী ভাই ?

-- কবে আসবে ?

-- সেই ডিসেম্বর মাসে। শীতের ছুটিতে !

-- সে তো অনেক দেরি !

বসে পড়েন সুমিতা। দুর্বোধ্য ব্যথা বুকে। তিনি এর সঙ্গে যুঝে উঠতে পারছেন না। কালো কালো স্বপ্ন হয়ে ঘুমের মধ্যে হানা দেয় কষ্ট। গোঙান, চমকে কেঁদে উঠেন। উঠে বসেন। সব সময়ে নির্মাল্যর ঘুম ভাঙে না। যদি ভাঙে বলেন -- কী হল !

-- বিশ্রী স্বপ্ন।

-- কী স্বপ্ন ?

-- একটা সমুদ্র ফুঁসে উঠছে, ঢেউয়ের মাথায় ভাই। হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। আমি তীরে দাঁড়িয়ে যতই এগোতে যাচ্ছি, পা নড়ছে না। আঠা দিয়ে যেন আঁটা।

তুমি বড় ভাবো। ভাবনা ছেড়ে দাও তো ! ভাল দিকগুলো ভাবতে পারছো না ? কলকাতার তুলনায় কত ভাল স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এত ডার্টি কমপিটিশন নেই। এখানে তো প্রতি স্টেপে দুর্ভাবনা। ছেলেমেয়ে নিয়ে মা-বাবারা জেরবার হয়ে যাচ্ছে ! এটা কিন্তু এক ধরনের স্বার্থপরতা সুমিতা। একটু কড়া গলায় বললেন নির্মাল্য। ক্লিনিক্যাল গলা। তিনি জানেন এসব ক্ষেত্রে আবেগকে প্রশ্রয় দিতে নেই।

বাকি রাত জেগে কাটান সুমিতা। আস্তে আস্তে আলো ফোটে। নির্মাল্য এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন। কিন্তু তাঁর তাড়া আছে। চট করে উঠে পড়েন সুমিতা। রাত-জাগা ক্লান্ত চোখে জলের ঝাপটা দিতে থাকেন। অঞ্জলিবদ্ধ জল। মুঠো মুঠো। যেন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন কোনও দেবতাকে। তাড়াতাড়ি কাজ করেন, শাড়িটা জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোতে যাবেন কী একটা সামনে পড়ল। আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিলেন। কোনও রকমে সামলে নিয়ে নিচু হলেন তিনি। ও মা ! এ তো টেডির টেডি। ভোঁতা মুখে কালো সুতোর সেলাই। ঈষৎ খয়েরি পুঁতি চোখগুলো তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন এক মূক অভিমানে। পেটটা মোটা। বেঁটে বেঁটে থাম-থাম হাত-পা, টেডি অনন্তকাল বসে থাকে। বেচারির স্রষ্টা তাকে এমনই করেই তৈরি করেছে। সুমিতা দু'হাত দিয়ে টেডিকে কোলে তুলে নেন। দ্যাখো তো ! ভাই কত স্বার্থত্যাগ করে তাঁর কাছে টেডিকে সমার্পণ করেছে। আজ তিনি ? এদিক-ওদিক তাকিয়ে টেডিকে একটা চুমি খেলেন তিনি। বাথরুমের কাছে একটা বেঁটে আলমারি। তার উপর রাজ্যের বই জড় করেছেন নির্মাল্য। নৈবেদ্যর চুড়োয় সন্দেশটির মতো বসেছিল বেচারি টেডি। টুক

করে পড়ে গেছে। আহা যেন তাঁর পায়েই পড়েছে। 'আমাকে একটু দ্যাখো দিদু, একটু আদর করো।'

খাবার টেবিলের উপর টেডিকে সামনে বসিয়ে টোস্ট, চা, কলা খেলেন তিনি। জুলজুল করে চেয়ে থাকে টেডি। তাকে কোলে করে আলমারির কাছে যান, তারপরই মনে হয় ইশ্‌শ। ভিতরে রাখলে ওর তো দমবন্ধ হয়ে যাবে ? আলমারির মাথার দুপাশে দুটো কুশন দিয়ে টেডিকে বসিয়ে দেন তিনি। বেশ আরামে বসেছে টেডি। সেই ভয় ভয় ভাবটা আর নেই। লক্ষ্মী কাজে এসেছে, তাকে বললেন -- দেখো আবার আমার ভাইয়ের টেডিকে, ফেলে-টেলে দিও না।

কেমন দেখছে দেখুন না। লক্ষ্মী মুখ টিপে হেসে বলে -- ঠিক যেন একটা বাচ্চা।

-- বাচ্চাই তো ! ভালুকদের বাচ্চা।

লক্ষ্মীকে খুঁটিনাটি সব নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সন্ধেবেলায় গা ধুয়ে চুল বেঁধে ধূপ জ্বালছেন সুমিতা। চন্দন ধূপের সুগন্ধ ধোঁয়া ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘরে ঘরে, পড়ার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দিলেন। এইবারে ধূপদানিতে ধূপগুলো গুঁজে সরিয়ে রাখবেন একপাশে। তাঁদের বাড়িতে কোনও ঠাকুরঘর বা ঠাকুরের কুলুঙ্গি নেই। এই পড়ার ঘরটাই ঠাকুরঘর। দেয়ালে ছবি আছে কিছু মহৎ মানুষের। ধূপ তাই আর সব ঘর ভ্রমণ করে এইখানে এসে থামে। কে যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ তুলে আলমারির মাথায় টেডিকে চোখে পড়ামাত্র হেসে উঠলেন তিনি। পুতুল হলে কী হবে ! দুষ্টুর শিরোমণি। মিটিমিটি হেসে তাকে নামিয়ে কোলে তুলে নিলেন। অবোধ দুটো পুঁতি চোখ দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে টেডি। অবোলা। নিজের কষ্টের কথা বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না আহা ! তাকে বুকে চেপে ধরেন সুমিতা। নিজের বুকের সমস্ত উত্তাপ বুঝি দিয়ে দেবেন।

ভরা বর্ষা। রোজই প্রায় ফিরতি পথে বৃষ্টি, জল জমে, জল মাড়িয়ে মাড়িয়ে রিকশা কি অটোতে উঠতে হয়। জেরবার অবস্থা। কলিগরা বলে, 'নীলনবঘনে নীলনবঘনে করে খেপে উঠেছিল, নাও এবার তোমার নীলনব ...' সুমিতা হেসে বলেন, এমন শাঁওন-ভাদোয় কেউ 'নীলনব'র জন্যে খ্যাপে না।

সে হল আষাঢ়ে। প্রথম বর্ষণ। আষাঢ়ের বৃষ্টি একটা শিহরণ, উল্লাস। নীল নীল হাতি দিগন্তে জমে উঠেছে স্তম্বের মতো হাত-পা নিয়ে। ক্রমশ হাতিরা পিন্ড পাকিয়ে এক মহাকায় হস্তিরাজ হয়ে যায়। সে একটা আলাদা ব্যাপার। আর শ্রাবণের বৃষ্টি হল বিরহীর কান্না, বাড়ির ভেতরে থাকলে, বাইরে থাকলে, ঘ্যানঘ্যানে, প্যানপ্যানে আর কোথাও উল্লাসের 'উ'ও নেই। ঘন ছাই রঙের মেঘ, আকাশ ছাওয়া কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। ভাদ্রর সুর আবার একঘেয়ে, একটানা, ভারী। যেন প্রলয় বর্ষণ হচ্ছে, সেই সঙ্গে অসহ্য গুমোট। ভূমিকম্প কিংবা জাপানের কুখ্যাত টাইফুন হানা দেওয়ার আগেটায় যেমন হয়। সারা শ্রাবণ-ভাদ্র নোংরা কাদা জড়ানো পা, নোংরা শাড়ি। সুমিতা বাড়ি ফিরে বালতি বালতি জল ঢেলে গা ধোন, পা ধোন। এবং অবধারিতভাবে পুজোর সময়ে বিশ্রী জ্বরে পড়েন। রীতিমতো সর্দি বসেছে বুকে।

টেলিফোনে রুনির আর্তনাদ ভেসে অসে -- মা তোমার গলা এমন ফ্যাঁসফ্যাঁসে কেন ? কী রকম কী রকম যেন শোনাচ্ছে।

মা বলেন, একটু ঠান্ডা লেগেছে, ও কিছু নয়।

-- মনে আছে তো ? নভেম্বরে আসছো কিন্তু।

-- নভেম্বরে তোর বাবা যেতে পারে, আমার তো স্কুল খোলা, কী করে যাব রুনি।

-- তবে ?

-- ডিসেম্বরের শেষটায় শীতের ছুটি পড়বে, তার সঙ্গে আরও কিছুদিন নিয়ে নেব।

-- এই যে তোমাদের তিন-চারমাস থাকার কথা ছিল। তোমাদের ঘর কী সুন্দর সাজিয়ে ফেলেছি। তোমাদের খাটের হেড-বোর্ডটা বেশ উঁচু। ঠেস দিয়ে বসতে পারবে। মা, চাকরিটা ছেড়ে দাও না। অনুনয়ের সঙ্গে একটু হুকুমেরও সুর যেন রুনির গলায়।

সুমিতা হাসলেন, আর তো হয়েই এল। তা ছাড়া নিজের কাজের ক্ষতি কেই বা সয়। কাজের পাকে সবাই বাঁধা। টেডি কোথায় ?

-- খেলতে গেছে মা।

-- কখন আসবে ? ফোন করবো।

ফোন করলেন কিন্তু টেডী ফোনে এল না।

-- মা, ও বাবার সঙ্গে চেস খেলছে। এই টুটু, দিদুকে একবার হ্যালো বলে যাও না।

-- না থাক। খেলুক। বাবাকে তো পায় না।

সুমিতা ফোন রেখে দিলেন।

নির্মাল্য বললেন, অসুখের কথাটা ওদের না বলার কোনও মানে হয় না।

-- বলারই বা কী মানে ? শুধু শুধু বেচারার চিন্তা বাড়বে।

-- মেয়ে মায়ের জন্যে চিন্তা করবে এটাই তো স্বাভাবিক। লুকোছাপার কী আছে ?

বলেন বটে কিন্তু নির্মাল্য ঠিকই বুঝতে পারেন -- রুনির মনের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছে তার তীব্রতা না বাড়ানোই ভাল। একটা সময় আসে যখন প্রিয়জনকে ছেড়ে দিতে হয়। পুরনো আর নতুনের মধ্যে গাঁটছড়াটা খুলে দিতে হয়।

-- বনের নিয়ম মনে আছে তো ? খুব আস্তে ধরা গল্যা বললেন সুমিতা।

-- বনের নিয়ম ?

-- পশুরা মরে লোকচক্ষুর আড়ালে গিয়ে। হাতিরা মরবার সময়ে দল ছেড়ে একা এক চলে যায় বিস্তীর্ণ শ্মশানে, সেখানে কোনও হাতি আর তার শেষ সময়ে সঙ্গ দেবে না।

নির্মাল্য চুপ করে গেলেন। একটাও কথা বলতে পারলেন না।

লক্ষ্মীপুজোর দিন মেঘ ভেঙে দশ দিক আলো করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। বৃষ্টি উবে গেছে। সুমিতার জ্বরও। সেই সঙ্গে একটু শীতের আমেজও। যে সব বছরে টানা একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়, তার উপর পুজো লেট, সে সব বছরে এমন হয়। ইভনিং ওয়াক সেরে এসে নির্মাল্য দেখলেন এক বোঝা রঙচংএ জামাকাপড় নিয়ে বসেছেন সুমিতা। টেডির মতো ছোটবেলাকার জামা দাদুর বাড়িতে ফেলে গেছে। সব গুছিয়ে তুলে

রেখেছিলেন সুমিতা। এ সব আর তার গায়ে হবে না। সুমিতা বেছে নিলেন একটা ছোট্ট ভেলভেট কর্ডের লাল প্যান্ট, আর একটা উজ্জ্বল হলুদ রংএর গোল গলা টি শার্ট। তাকে মিকি আঁকা। মন দিয়ে টেনেটুনে টেডিকে পরালেন। একটু দূরে ধরে দেখতে লাগলেন। তারপর এক মুখে হেসে বুকে টেনে গভীরভাবে জড়িয়ে রইলেন। নির্মাল্য টুক করে সরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বোধহয় ছায়া পড়েছিল, সুমিতা ফিরে তাকালেন। বললেন -- কী চমৎকার ফিট করেছে দ্যাখো। মানিয়েওছে দারুণ। আরও বোকলু দেখাচ্ছে, আরও মিষ্টি, না ?

নির্মাল্য হাসলেন -- হঠাৎ এ খেয়াল।

-- এতদিন কেন হয়নি সেটাই তো আমার আশ্চর্য লাগছে -- ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন সুমিতা -- ভাইয়ের জামাকাপড়গুলো পড়ে রয়েছে, এদিকে টেডিবাবু ন্যাংটা-পুটো হয়ে ... ওর না জানি কত লজ্জা করেছে। বড় হচ্ছে না !

দুজনে টেডিকে নিয়ে খুব হাসাহাসি হল। মন চলে গেল পুনায় -- দাদুভাই, তোমার টেডি তোমার শার্ট-প্যান্ট পরেছে জানো তো ? তোমার দিদু কী সুন্দর সাজিয়েছে ? খুব খানিকটা হাসল টুটু, এখন তার টুটু নামটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে, তারপর খুব বিজ্ঞ বিজ্ঞ গলায় বলল -- ভাল করেছে দিদু। টেডিটা যা বোকা ! ওর জন্যে স্লেট-পেন্সিল কিনে দিতে বোলো। থোড়া ম্যাথস, থোড়া আংরেজি ভি আনা চাইয়ে।

-- তুই হিন্দি শিখছিস টুটু ?

রুনি বলল -- মা, ও খুব তাড়াতাড়ি পিক আপ করছে। তোমরা যখন নভেম্বরে কি ডিসেম্বরে আসবে তখন দেখবে গড়গড় করে বলছে। আসলে বন্ধুদের সঙ্গে তো বেশিরভাগই হিন্দি বা ইংরেজিতে কথা বলতে হয়।

সুমিতা বলেন -- শিখছে টুটু, শেখাচ্ছে রুনি, কিন্তু আমার মনে হয়, আমি যেন কেঁচে গন্ডুষ করছি। রুনিকে নিয়ে স্কুল থেকে স্কুল দৌড়োদৌড়ি, অ্যাডমিশন টেস্ট, ক্লাস টেস্ট, হোম টাস্ক, নিয়ে চলো টেনে অ্যান্ডার্সনসে, আবার গানের ক্লাসে, বাড়িতে আঁকার মাস্টারমশাই। কী সব দিন গেছে। মেয়েটার উপর কী অত্যাচারই করেছি। -- পরে আস্তে বললেন, কী-ই বা কাজে লাগল।

-- বাঃ এটা তুমি কী বললে -- নির্মাল্য বললেন -- এই যে ট্রেনিংগুলো ও নিয়েছে এতে করেই তো ব্যক্তিত্বটা তৈরি হয়েছে। টেনিস খেললেই কি স্টেফি গ্রাফ হতে হবে ? গান শিখলেই পরভিন সুলতানা ? সুচিত্রা মিত্র ?

কিন্তু নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওঁদের পুনা যাওয়া হল না। সুমিতা বিশ্রী রকম হেপাটাইটিসে পড়লেন। এবার মায়ের অসুখের সংবাদ ওদের জানাতেই হল। সৃঞ্জয় উদ্বিগ্ন গলায় বলল -- সে রকম কঠিন কিছু হলে তো নার্সিংহোমে দিতে হবে !

-- না সেরকম এখনও না -- নির্মাল্য আশ্বাস দেন।

দু-চারদিন পর সক্কালবেলায় বেল শুনে দরজা খুলে অবাক। রুনি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা রোল-অন লাগেজ।

-- তুই ?

-- মা কই ? রুনি দৌড়ে এসে মায়ের ঘরে ঢুকে যায়। চোখ দিয়ে ঝরঝরঝর।

-- কত কী ভেবে রাখলুম -- গোয়া যাব, অজন্তা-ইলোরা যাব সবাই মিলে। মা তুমি কী যে করো। ফুচকা খেয়েছিলে নাকি ? কতবার বলেছি ... ঈশ্‌শ তুমি কী রোগা হয়ে গেছ।

দুর্বল শরীরে মেয়েকে জড়িয়ে হাসি-কান্নার মাঝখানে সুমিতা জিজ্ঞেস করলেন -- আর সব কই ?

-- আর কেউ কী করে আসবে মা ? সৃঞ্জয়ের অফিসের কি একটা দিনও রেহাই আছে ? আর টুটু ? সেও তো ! কী টেস্ট ! কী টেস্ট ! ভেবেছিলুম কলকাতা থেকে নিয়ে যাচ্ছি, ছেলেটার উপর এতটা প্রেশার পড়বে না, তা কোথায় কী ! সেই পিঠে ভূতের বোঝা। সেই একগাদা হোম টাস্ক ...

তা ওকে কে দেখবে ? তুই এমন চলে এলি ?

আজ শুক্রবার। শনি-রবি সৃঞ্জয়বাবু বাড়ি থাকবেন, তাই ভরসা করে এসেছি। সোমবার সকালেই চলে যাব।

মেয়ের দিকে তৃষিত চোখে চেয়ে থাকেন সুমিতা। চেয়েই থাকেন। সম্মুখে তাঁর ভরা যৌবন, তাঁর সদ্য মাতৃত্ব, তাঁর অপার ব্যস্ততা, তাঁর কন্যার ফ্রক পরা শৈশবও। চোখ বুঁজে মেয়ের হাতটা ধরে থাকেন।

-- তোমার কি বেশি দুর্বল লাগছে, মা ?

নির্মাল্য বললেন -- দ্যাখ, তুই তো ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছিস। প্রথমটায় একটু মুহ্যমান, কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ পরই চাঙ্গা হয়ে যাবে।

মায়ের জন্য পথ্য রান্না করল রুনি। এখন তিনি একটু একটু খেতে পারছেন।

-- ও মা ! ও কী ? রুনি হঠাৎ হাসতে থাকে।

-- কী ? -- ওই।

আলমারির মাথায় নৈবেদ্যর চুড়োয় সন্দেশটির মতো বসে আছে টেডি। কমলালেবু প্যান্ট, নীল টি শার্ট, মাথায় একটা কালো কাউন্টি ক্যাপ।

-- কী মজার দেখাচ্ছে বাবা !

নির্মাল্য হাসেন। সুমিতাও ক্লান্ত-ক্লান্ত লাজুক লাজুক হাসেন।

নির্মাল্য বললেন -- টেডিবাবুর গয়না ক্রমশই বাড়ছে।

-- আহা ! কী আবার বাড়ল ? সুমিতা বিব্রত।

-- কেন ? ভাইয়ের ছোট্ট রুপোর বাটি, রুপোর গেলাস ...

সুমিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন -- ছোট্টতে তো আমার কাছেই বেশি খেত। বোতল ছাড়িয়ে গ্লাস ধরালুম ওইটাতেই। তুইও ওটাতেই খেতিস। বাটিটাতে মুড়ি ...

-- মনে আছে বাবা, কী রকম পা দুটো দু'ফাঁক করে ছড়িয়ে বসত, মাঝে মুড়ি ভর্তি বাটি। যত খাবে তার চেয়ে বেশি ছড়াবে।

-- তুই এবার ওগুলো নিয়ে যাস -- সুমিতা বললেন।

-- বারে, আমি নিয়ে কী করব ? তুমিই ওগুলো রেখে দাও।

কীসের যেন প্রতিধ্বনি। কে যেন কবে এমন বলেছিল। কাকে !

রুনি ফিরে যাওয়ার পরে, বেশ পরে, তখন জাঁকিয়ে শীত পড়তে শুরু করেছে, সুমিতা তখন অনেকটা সুস্থ। দিন সাতেক পরেই কাজে যোগ দেবেন। সকালবেলার রোদ আড় হয়ে পড়েছে কোলের উপর, টেডির পোশাক বদলাচ্ছেন, মনে পড়ে গেল। কে বলেছিল, কখন বলেছিল, কী উপলক্ষে।

-- 'টেডিকে তুমিই রেখে নাও।' ... 'আমি নিয়ে কী করব ? ... তুমিই ওগুলো রেখে দাও' ... তুমিই রেখে নাও ... তুমিই ওগুলো রেখে দাও ... রেখে নাও ... রেখে দাও ...

দুর্বল মাথার মধ্যে গলাগুলো গুলিয়ে যায়। শব্দে শব্দে জট পাকিয়ে যায়। খালি শূন্য পৃথিবীতে ধ্বনির ব্রেকার ভাঙে।

আজ বহুদিন পরে ফোন তুলে সৃঞ্জয়ের গলা শুনলেন নির্মাল্য। ফোন রুনিই করে, সৃঞ্জয় ক্বচিৎ কদাচিৎ।

আশ্চর্য, উৎফুল্ল হয়ে বললেন -- আরে, কী ব্যাপার ?

-- এই তোমরা কেমন আছ ? আমার সঙ্গে কথা তো হয় না ...

নির্মাল্য বললেন -- ভালই তো আছি। তোমার কাজকর্ম সব ...

-- ঠিক আছে তবে ইয়ে মানে বাবা আমাদের ডালাসে চলে যেতে হচ্ছে। প্রতি মাসেই ট্যুর নিতে হচ্ছিল। অফিস আর আমাকে এখানে রাখতে চাইছে না ... কী হল, কথা বলছ না যে।

গলা পরিষ্কার করে নির্মাল্য বললেন -- না ইয়ে, খবরটা এমন হঠাৎ ...

ঠেকিয়ে রেখেছিলুম অনেকদিন, কিন্তু আর ... মাকে একটু বুঝিয়ে বোলো প্লিজ।

-- তুমিই বলো না।

-- না আমি মানে গাড়িতে, একটা জরুরি কাজে ... শোনো আমরা যাচ্ছি মাসখানেকের মধ্যেই। কিছুদিন থাকব, তারপর ওখান থেকেই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, বুঝলে ? একসঙ্গে থাকা হবে, তা দিন পনেরো তো বটেই ... বাবা ডোন্ট ওয়রি। ওখানে গিয়ে একটু সেটল করেই তোমাদের টিকিট পাঠাবো। বাই ...।

-- কার ফোন ? সুমিতা ঢুকছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন।

-- সৃঞ্জয়ের।

-- সৃঞ্জয়ের ? কী ব্যাপার সৃঞ্জয়বাবুর। হঠাৎ ?

-- ওরা আমেরিকায় যাচ্ছে -- বিনা ভূমিকায় বললেন নির্মাল্য।

-- ক'দিনের জন্যে ?

-- ফর গুড। অবভিয়াসলি।

ওরা এসে যায়। সৃঞ্জয়, রুনি, টুটু। রুনি মুখ গোমড়া করে আছে। সৃঞ্জয় কি একটু ক্রুদ্ধ ? সে কী করবে ? তার রুজি-রোজগার। তার চাকরি তাকে যেখানে টেনে নিয়ে যাবে .. যেতেই হবে। উপায় কী ? মাঝপথে তুমি ইচ্ছে করলেও থামতে পারো না। বোঝাও এখন সব অবুঝ বউকে ! চিরদিন একরকমের ইম্ম্যাচ্যুওর রয়ে গেল। টুটু বরং অনেক সহজ। এই বছর দেড়েকে সে অনেক স্মার্ট, বুঝদার হয়ে গেছে। স্কুল, কম্প্যুটার আর ক্রিকেটের জগতে বেমালুম লোপাট। এই দুই সিনিয়র সিটিজেনের মান ভাঙো এখন ! সদ্য অবসর নিয়েছেন সুমিতা, কথা ছিল এই পুজোতেই যাবেন পুনা। অনেক দিনের জন্য। অনেক দিন। কত দিন তা আগে থেকে ঠিক থাকবে না।

ঘনঘোর বর্ষা যায়। বর্ষার পর শরৎ আসে। শিউলি ছড়ানো পথে অবিরল বিসর্জনের ঢাক বাজে। লক্ষ্মী পূর্ণিমার কোজাগর চরাচর ছেয়ে দেয়। অন্ধকারের বুকে হাজার হাজার আলোর কণা দীপ দীপ করে ভূত চতুর্দশীতে। তারপর শীত। তেমন তেমন বর্ষা ঘটলে শীতের কামড়ও বাড়ে।ট্রাঙ্ক থেকে বার হয় কম্বল, আলোয়ান, শাল, উলিকট ... এবং বেরোয় ছোট্ট ছোট্ট লাল নীল সোয়েটার, গোলাপি উলের পুরো

স্যুট। নানা রং দিয়ে আনকোরা নতুন একটা বুনতে থাকেন সুমিতা। এবার টেডির একেবারে মাপে মাপ। আর সৃঞ্জয় দেখতে থাকেন নন্দলালার ফেলে যাওয়া শৈশব বহুযুগের ওপারে কেমন করে ধীরে কুন্ডলীভূত হয়ে উঠেছিল।

◆ সমাপ্ত ◆